প্রথম আলো

মতামত

কওমি সনদের স্বীকৃতি, রাজনীতি ও ‘শুভঙ্করের ফাঁকি’

লেখা: মনযূরুল হক

আপডেট: ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ০৯

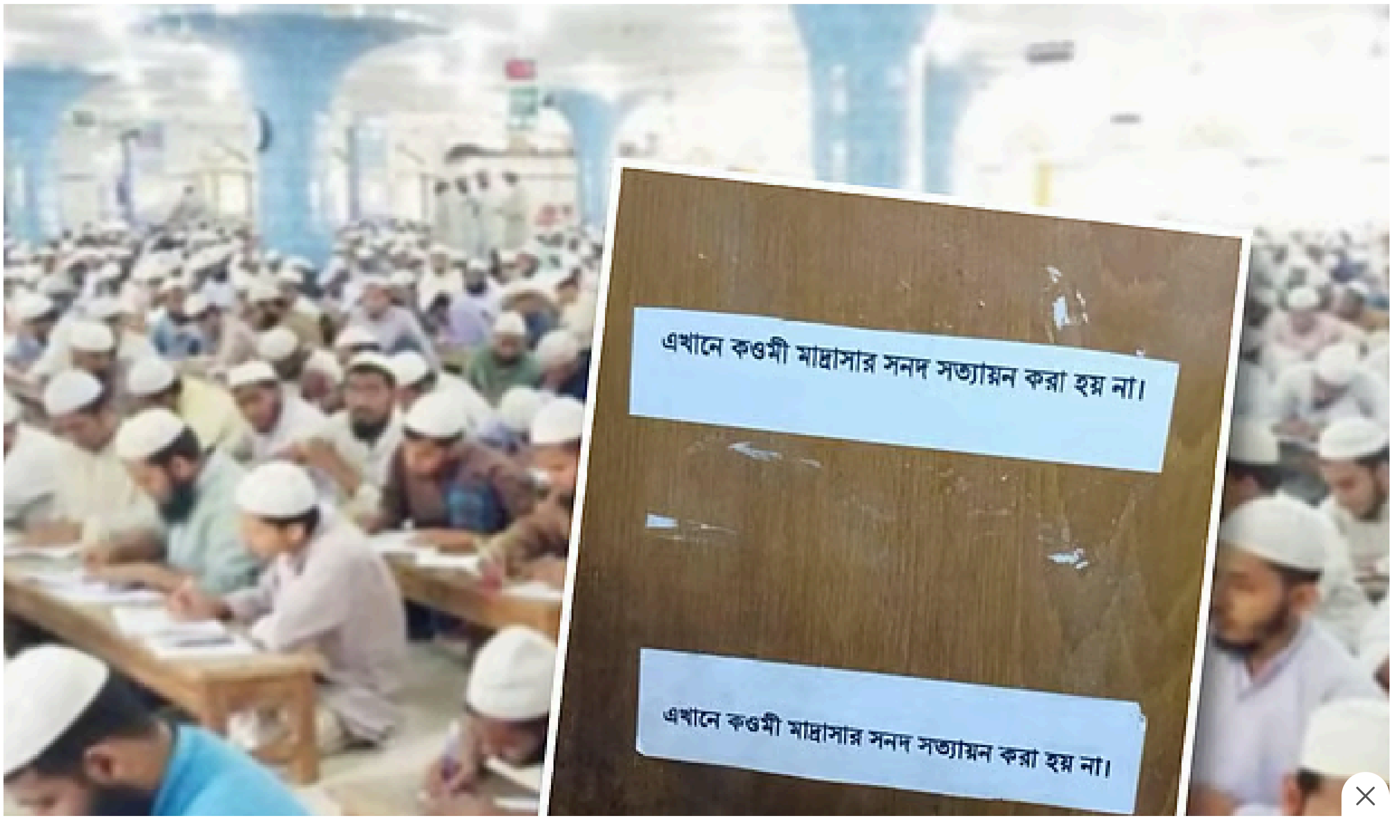

‘নামমাত্র যেই কাগুজে সনদ দেওয়া হয় সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে সনদের সমমান মানা হয় না। উচ্চশিক্ষায়ও বাধা। বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা যায় না।’ *কোলাজ: প্রথম আলো*

বছরখানেক আগে ফেসবুকের একটি পোস্টের সূত্র ধরে ইনবক্সে একটি ছবি পেলাম—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে স্টিকার লাগানো ‘কওমি সনদের সত্যায়ন করা হয় না’। সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে সরকারের ঘোষণা এবং তাতে কওমি পড়ুয়াদের আবেদনের অযোগ্যতার বিষয়টি সামনে আসার পর ছবিটার কথা আবার মনে পড়ল।

সরকার ঘোষণা করেছে, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৯ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তবে সংসদের প্রশ্নোত্তরে মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের সনদ স্বীকৃতি নিয়ে কিছু জটিলতা রয়েছে। কওমি মাদ্রাসার অনেক শিক্ষার্থী কিরাত (কোরআন তিলাওয়াত) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও মূলধারার মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত না থাকায়, তাদের সনদ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হচ্ছে।'

কওমির এই সনদ স্বীকৃতির জটিলতা এক দীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৯২ সালে প্রথম জাতীয় দাবি আকারে উপস্থাপিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে এই দাবির ভিত্তি পায় গত বিএনপি সরকারের আমলেই। ২০০৫ সালের ১৫ এপ্রিল সে সময় জোট সরকারের শরিক শাইখুল হাদিস আজিজুল হকের নেতৃত্বে 'কওমি মাদ্রাসা জাতীয় ছাত্র কনভেশন' অনুষ্ঠিত হয়। সনদের সরকারি স্বীকৃতি দাবিতে মুক্তাঙ্গনে তিনিসহ পাঁচ দিনের অনশন করেন শিক্ষার্থীরা।

তত দিনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোটে ভাঙন শুরু হয়েছে, শাইখুল হাদিসের খেলাফত মজলিস ও আওয়ামী লীগের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরও সম্পন্ন। সরকারের শেষ সময়ে এসে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তর সমমান দেওয়া হবে বলে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে বিএনপি সরকার।

এই প্রজ্ঞাপনকে সামনে রেখে ইউজিসির অনুমোদন নিয়ে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় কওমি মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের অনার্স-মাস্টার্স করার সুযোগ দেয়। একাধিক বেসরকারি ব্যাংক কয়েকজন কওমি সনদধারীকে চাকরিও দেয়।

এরপর ফখরুদ্দীন-মঈনুদ্দিনের আমল এলে বিষয়টি আর আলোর মুখ দেখেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শাহবাগ আন্দোলন এবং তার প্রতিক্রিয়া ৫ মে শাপলা চত্বরের হত্যাযজ্ঞকে কেন্দ্র করে কওমি ঘরানার নেতাদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক দাঁড়ায় আদায়-কাঁচকলায়।

দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ সময়ে নির্বাচনের আগে আগে দূরত্ব ঘোচাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি নেতাদের গণভবনে আমন্ত্রণ জানান এবং কওমি সনদের স্বীকৃতি নিয়ে নতুন করে ঘোষণা দেওয়া হয়।

২০১৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে পাস হওয়া আইনের মাধ্যমে 'আল-হাইআতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ'-এর অধীনে দাওরায়ে হাদিসকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গেজেট হয়। হেফাজতে ইসলামের আমির আহমদ শফীর সভাপতিত্বে শোকরানা মাহফিল হয়। প্রথম পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি অস্থায়ী প্রকল্পের আওতায় দারুল আরকাম মাদ্রাসায় ১ হাজার ১০ জন কওমি আলেমকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

মাস্টার্স সমমান বলা হলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি মাস্টার্স করার আবেদন করার যোগ্য বলেও তাঁরা বিবেচিত হন না। পাসপোর্ট, আইএলটিএস আবেদনেও কওমি সনদের কথা উল্লেখ করা যায় না। ফলে অনেক মেধাবী আলেম প্রাইভেট টিউশনি, মসজিদের ইমামতি বা ছোটখাটো ব্যবসায় আটকে থাকেন। তাহলে এত আন্দোলন, এই আইন, সেই প্রজ্ঞাপন, ঘোষণা, শোকরানা—সবই কি শুধু কাগজে-কলমে?

এই পর্যন্তই। এরপর আওয়ামী লীগ আরও ছয় বছর ক্ষমতায় থাকলেও বিসিএস, উচ্চাশিক্ষা বা গবেষণা, ধর্মীয় শিক্ষক বা বা কাজি পদে চাকরির কিছুই আর সেই স্বীকৃতির ফলাফলে দেখা যায়নি।

জুলাইয়ের পরে নতুন করে কওমি মাদ্রাসা আলোচনায় আসে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বিপুল অংশগ্রহণ ছিল। জুলাইয়ের শহীদদের মধ্যে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সংখ্যাটাও কম নয়। যদিও আন্দোলনের সূচনা হয় সরকারি কোটাবৈষম্যকে কেন্দ্র করে, যেখানে কওমি পড়ুয়াদের জন্য কোটা তো দূরে থাক, কোথাও কোনো ভ্যাকেন্সিই নেই, সেখানে কেবল জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের এই অনমনীয় অবস্থান গণমাধ্যমে বিশেষভাবে উঠে আসে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা কমিটিতে স্থান পান কওমি মাদ্রাসা থেকে উঠে আসা একজন আলেম।

তবে অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে সনদ কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শেষ সময়ে এসে (৭ ডিসেম্বর ২০২৫) কওমি সনদধারীরা নিকাহ রেজিস্টার বা কাজি পদে নিয়োগ পেতে পারেন, তার নিশ্চয়তা আসে আইন মন্ত্রণালয় থেকে। যদিও এই পদটি মাস্টার্স সমমান নয়, বরং আলিম বা এইচএসসি সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার পদ।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, এবি পার্টি, গণসংহতি আন্দোলনসহ শীর্ষস্থানীয় প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে কওমি শিক্ষাধারার উন্নয়নের উল্লেখ ছিল প্রতিশ্রুতি আকারে। ক্ষমতাসীন বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, ‘কওমি সনদ স্বীকৃতির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে।

কওমি সনদধারীদের বিদেশে (যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ) ধর্মীয় উচ্চশিক্ষালাভে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বিশেষত সরকারি মসজিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষক কাম ইমাম, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’

বিএনপি সরকারের আগের আমলে কেন স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েও কওমি সনদ কার্যকর করা গেল না, নির্বাচনী সমাবেশে গিয়ে তার একটা কৈফিয়ত দাখিল করেছিলেন তৎকালীন এবং বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক

মিলন।

তাঁর দাবি, সে সময় কওমি মাদ্রাসার জন্য সরকার স্বীকৃত বোর্ড করতে বিএনপি রাজি ছিল, কিন্তু জোট সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামীর দুই মন্ত্রী মরহুম মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এবং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এই স্বীকৃতি কার্যকর করতে বাধা দেন। তিনি তখন প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তাঁকে পুনরায় নির্বাচিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে কওমি মাদ্রাসার এই স্বীকৃতিকে কার্যকর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা কত, তার সুনির্দিষ্ট কোনো জরিপ নেই। তবে কওমি শিক্ষাধারার সবচেয়ে বড় বোর্ড ‘বেফাকুল মাদারিস’ আওতাভুক্ত প্রায় ৩০ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে বলে জানা যায়। দেশের আনাচে-কানাচে আরও বহুসংখ্যক মাদ্রাসা এবং অনেকগুলো বোর্ড রয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশ, বিভিন্ন বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসাগুলোতে বিভিন্ন স্তরে বর্তমানে প্রায় ৫০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। আর দাওরায়ে হাদিসের সনদ দেয় যে বোর্ড, তার অধিভুক্ত আছে হাজারের বেশি মাদ্রাসা, যেখান থেকে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী দাওরায়ে হাদিস নামের একটি শিক্ষাস্তর সম্পন্ন, আদতে যার কোনো রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নেই।

নামমাত্র যেই কাগুজে সনদ দেওয়া হয় সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে সনদের সমমান মানা হয় না। উচ্চশিক্ষায়ও বাধা। বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা যায় না। একজন কওমি গ্র্যাজুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল করতে গিয়ে কওমি সনদ নিয়ে অনার্স করার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছেন—এমন অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

মাস্টার্স সমমান বলা হলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি মাস্টার্স করার আবেদন করার যোগ্য বলেও তাঁরা বিবেচিত হন না। পাসপোর্ট, আইএলটিএস আবেদনেও কওমি সনদের কথা উল্লেখ করা যায় না। ফলে অনেক মেধাবী আলেম প্রাইভেট টিউশনি, মসজিদের ইমামতি বা ছোটখাটো ব্যবসায় আটকে থাকেন।

তাহলে এত আন্দোলন, এই আইন, সেই প্রজ্ঞাপন, ঘোষণা, শোকরানা—সবই কি শুধু কাগজে-কলমে?

৯ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণায় কওমি শিক্ষার্থীদের আশা জেগেছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, সনদ ও কিরাত বিষয়ে জটিলতা আছে। কওমি সিলেবাসে কিরাত আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় প্রশাসনিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর পেছনে দায় কার? শুধু সরকারের, কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষেরও? অনেক শিক্ষার্থীর দাবি, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হলো, সঠিকভাবে সনদের সত্যায়ন হলে মাদ্রাসায় ছাত্র পাওয়া যাবে না।

কওমি কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতা এখানেই। তাঁরা স্বীকৃতি চেয়েছেন, কিন্তু স্বীকৃতির পর কী করবেন—সে পরিকল্পনা করেননি। সিলেবাস আধুনিকায়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, এমনকি উচ্চতর গবেষণা বা বিসিএসের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি কোর্সও চালু করেননি। ফলে স্বীকৃতি হয়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থান শূন্য।

আবার কর্মসংস্থান হবেই-বা কী করে, শুধু নিরেট ধর্মশাস্ত্রীয় পদ আছেই-বা কয়টা? যা আছে, তা দিয়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর চাহিদার ১ শতাংশও পূর্ণ হবে না। সুতরাং প্রশ্নটা হলো, সরকার কোন বলে তাদের স্বীকৃতি কার্যকর করবে? কার্যকর করলে কওমি সনদধারীরা বলবেন, সাধারণ শিক্ষাধারার সবার মতো তাদেরও উপযুক্ত সব সরকারি-বেসরকারি পদে আবেদন করার অনুমতি দিতে হবে। সেটা কি সরকার পারবে?

আলিয়া মাদ্রাসায়ও আলিম (এইচএসসি) স্তরে বাধ্যতামূলক ২০০ নম্বরের ইংরেজি পড়তে হয়। এমনকি আজকাল তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণিতেও সমাজবিজ্ঞান, আইসিটি, সাধারণ জ্ঞানের বই পাঠ্যভুক্ত। অথচ কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসে বাংলা-অঙ্ক-ইংরেজি থাকলেও তা মাধ্যমিক স্তর পার করার মতো নয়। তাহলে উভয়ের সনদের মান ও সুযোগ সমান কী করে হয়—সেই প্রশ্ন কি সমাজ থেকে উঠবে না?

ফলে সব মিলিয়ে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে নানা দিক থেকে ভাবনার জায়গা আছে। স্বীকৃতির ঘোষণার সময়েই অনেক শিক্ষাবিদ আপত্তি করেছিলেন যে একটা বোর্ডের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় মানের স্বীকৃতি হতে পারে কি না। তা ছাড়া সরকারকে সনদের পূর্ণ সমমান নিশ্চিত করতে হবে—শুধু দাওরায়ে হাদিস নয়, নিম্নস্তরগুলোকেও। এসব না দেখলে শুধু রাজনৈতিক দর-কষাকষিতে কওমি থাকলেও কাজের কাজ কিছুই হবে না।

কওমি নেতাদের প্রতি বিনীত নিবেদন—ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের কথা ভাবুন। আর সরকারের কাছে প্রত্যাশা, কওমি মেধাবীদের কেবল ‘দোয়া-মাহফিলের’ সম্বল না বানিয়ে রাষ্ট্রের মূলধারার সম্পদে রূপান্তর করুন। নয়তো এই ‘সমমান’ নামক স্বীকৃতির তকমাটি চিরকাল একটি ‘শুভঙ্করের ফাঁকি’ হয়ে থাকবে।

কওমি সনদের স্বীকৃতি যদি কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেটি হবে ইতিহাসের এক বিশাল প্রতারণা। নেতৃত্বের ব্যর্থতা বা প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে একটি প্রজন্মের সতেরো-আঠারো বছরের শিক্ষাজীবন বৃথা যেতে পারে না।

- **মনযূরুল হক** প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক

মতামত লেখকের নিজস্ব

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো